

মনজান বিবির বিরাশি বছর জাহেদ সরওয়ার

আসমানে সটাং করে দাঁড়ানোর পর সূর্য যখন ধীরে ধীরে পশ্চিমে হেলতে থাকে তখন তার আলোটাও নরোম গাঢ় সোনালী হতে থাকে। শীতকালে এই নরম রোদ্দুর কেমন এক রূপালি মায়ার জাল বিস্তার করে। এইসব রূপালি বিকেলে গ্রাম বাংলার উঠোনে উঠোনে শিশুরা যেন নিজেদের অজান্তে উন্মত্ত হয়ে উঠে। তারা মাটিতে আঁক কষে ঘর বানায় কুতুকুত খেলে, এ গুকে ধাক্কা মারে, মারামারি করে, চিল্লাচিল্লি করে ধুলো ওড়ায়। কেউ যদি বসে, মনজানবিবি যেভাবে বসে লাঠিতে ভর দিয়ে, উবো হয়ে উঠোনে এক কোনায়। তবে দেখতে পাবে ধুলোগুলো উড়ে উড়ে যেন সূর্যের দেশে ধায় আর ধুলোগুলোর ভেতর সূর্যরশ্মি যেন এক পবিত্র চিত্র রচনা করে। সেদিকে তাকিয়ে মনজান বিবি কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। যদিও শিশুদের হট্টগোল তাকে সঙ্গ দেয় তবু সে মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ে। এ যে যে ই আছাড় খাই পড়িবা। সু-দীর্ঘ বিরাশি বছর বয়সের ভার আর দীর্ঘদিন রোগে ভোগার ফলে এ দিয়ে শুরু হলেও সমষ্টির প্রতি জোর দেয়ার কারণে 'ই' টা টানা কান্নার মত শোনায়। ছেলেমেয়েদের দল তার কথায় কান দেয়না। তবুও সে দুঃখ পায়না, এ ব্যাপারটা সে একটা বাগধারার আন্ডারে ফেলে দেয়। 'বোরার কথা কোরায় ন ফুনে'। বাচ্চাদের এসব চীৎকার টেঁচামেচি তার স্মৃতিতে জমে থাকা ধুলোগুলো যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। যুগান্তরের সৃষ্ট মাকড়সার জাল ছিঁড়ে সে যেন হাজির হয় তার শৈশবে। চোখ বুঁজে বুঁদ হয়ে থাকে। শৈশবের নিজেসঙ্গে সে যেন ঘষে ঘষে জাগিয়ে তোলে। এক ধরনের সুখ আর শোক তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন তার ডান চোখের ডান কোনায় আর বাম চোখের বাম কোনায় পানির কনা ঝরে আর মানুষ ঘুমের ভেতর অতি সুখের স্বপ্ন দেখলে যেমন ধীরে ঠোঁট জোড়াকে প্রসারিত করে হাসে, তেমনি হাসে। তারপর সে চোখ খুলে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকায়। দীর্ঘ অতীত যাত্রার রেশ তাকে গম্ভীর করে রাখে। ডিসেম্বর, শীত এখন মনজান বিবির কাল হয়েছে। সূর্য ডুবে গেলে ঠাণ্ডা চাদর বিছিয়ে যখন নেমে আসে। মনজান বিবিকে তখন বাধ্য ছেলেমেয়ের মত কাঁথার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হয় অথবা বসে থাকতে চাইলে প্রস্তর যুগের গুহামানবদের মত আগুন জ্বালিয়ে নিতে হয় অথবা কুমোরদের তৈরী একটা আইল্লাতে আগুনের কয়লা আর তুষের সমন্বয় সাধন করে সেটা শালের ভেতর শরীরের সাথে নবজাতক সন্তানের মত জড়িয়ে রাখতে হয়। তবুও মাঝে মাঝে শীতের প্রকোপ বেড়ে গেলে, পোকায় খাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, ফোঁকলা দাঁতের উপরের মাড়ির সাথে নীচের মাড়ির সংঘর্ষ কেউ ঠেকাতে পারেনা। বুড়ো আর শিশু যেন বয়সের চালে এক হয়ে যায়। তাদের প্রতি যৌবনের একধরনের অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়। শিশুদের হয়তো এটা বোঝার ক্ষমতা নেই। মনজান বিবিকে সবচাইতে কষ্ট দেয় এই অবজ্ঞা। অথচ তার কিছু করারও নেই। চোখের সামনে আপন পেটের সন্তান। যাকে দশমাস দশদিন পেটে ধরে, জন্মদিয়ে, লালন পালন করে গড়ে তুলেছে। সে কেমন পর হয়ে যায় - পরইতো। মনজান বিবি সংসারের সব খবর জানতে চায়। কিন্তু ছেলের কথা হচ্ছে বুড়ো মানুষ এত কিছু শুনে কি হবে, আল্লা আল্লা কর এখন আখিরাতে আর পুলসেরাতে। তাকে বাতিলের খাতায় তুলে দিয়ে আপন স্ত্রী পুত্র নিয়ে ছেলেটা কি রকম এক বৃত্ত রচনা করেছে। মনজান বিবির যৌবনের দাপটময় দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। যখন ছেলেপিলে, গাউর, মাঝি সবাই এক ডাকে তার ভয়ে হুমড়ি খেত। চাবির গৌছাটা ঝন করে আঁচল সমেত পিঠে ফেলে দিয়ে দম্ভ ভরে চলে যেত। কি রকম একা এক জনই একর ব্যাপী শাকসবজির শীতকালীন ক্ষেতটার রক্ষণাবেক্ষণ করতো। সকালে পানি বোরানো থেকে শুরু করে আগাছা বাছা পর্যন্ত। চোখের সামনে কেমন করে বেড়ে উঠতো মুলা, পেকে উঠতো মরিচ, লম্বা হত বরবাটি। সবুজ সবজির আন এখনও তাকে কেমন যেন সুরতগু করে দেয়। এবারে শীতেও যখন মনজান বিবি ছেলের কাছে প্রস্তাব করল সবজি ক্ষেত করার। তখন ছেলে 'কি দরকার' 'তুমি পারবনা' জাতীয় কথা বলে তাকে বিরত করতে চাইছিল। হা আল্লা, সে কি করে বোঝাবে যে সবুজ শাকসবজি, ফলমূলের সাথে যোগাযোগ থাকলে প্রাণটা কি রকম সজীব থাকে। কিছু না করে রোদে শুকিয়ে শুকিয়ে শীতে কেঁপে কেঁপে সেকি চুপসে যাওয়া কিসমিস হয়ে যাবে নাকি। তার গৌ ধরার কারণে অবশেষে সে ক্ষেতটা করতে পারল। ছেলের ছেলে জাকির সাথে আবার বুড়ির খুব ভাব। জাকিকে যুতে পেলে বুড়ি তার শৈশবের আর কৈশোরের আর যৌবনের আর বাধকোর কত গল্পো নিমিষে শুনিয়ে দেয়। একেকটা গল্প একাধিকবার শুনতে শুনতে জাকির শিশুমনে এগুলো জীবন্ত হয়ে উঠে। এগুলো সে আবার তার মতো করে বুড়িকে শুনিয়ে দেয়। বুড়ি শুধু হা হা করে। অবাধ হয়, হাসে, ভয় পাবার ভান করে। জাকির সঙ্গে বোঝাপড়াটা আরো পাকা করে নেয়। জাকিও দাদিমা বলতে অজ্ঞান। দিনের বেশীর ভাগ সময় জাকি বুড়ির সঙ্গেই থাকে। বুড়োকালের পরিকল্পনাগুলোও বোধয যৌবনের কাছে আশ্চর্য লাগে, বোকাসোকা লাগে, তা না হলে মনজান বিবির ক্ষেতের পুকুরের পাশে বাসা করার কাথাটা ছেলের কাছে আশ্চর্য লাগবে কেন! একদিন গাউর ডেকে ধানকাটা শুকনো খড় দিয়ে একটা বাসা করিয়েও দেয়। খড়ের বাসাটার দিকে তাকিয়ে বুড়ির সমগ্র জীবনের আশা পূরণের মত সুখানুভূতি হয়। বুড়ির শীর্ন হাতখানি খড়ের ওপর বুলায়, কেমন কোমল অনুভূতি হয়। মাঝে মাঝে জাকি ভোস ভোস ঘুমায়। বুড়ির দুই প্রাগৈতিহাসিক চোখে ঘুম আসেনা। রাত যখন গভীর হয়

জোৎস্নার প্লাবনে ছেয়ে যায় চরাচর। শীতের কুয়াশাম্মাত সবুজ মুলাপাতা পেঁয়াজের ডাঁটা চিকচিক করে। কোথাও দূরে কুকুরের ছেড়া ছেড়া ডাক শুনা যায়। বুড়ির তখন মরনের ভাবনা হয়। মৃত বুড়াকে মনে পড়ে। পুলসিরাতে কথ্য ভাবে। বুড়ির এখন কিছুই করার নেই। ভাবনা, ভাবনা আর কল্পনা। অতীতের সব স্মৃতিগুলো মস্তিস্কের স্মরণ চিত্র ঘেঁটে ঘেঁটে চোখের সামনে নিয়ে আসা আর মৃত্যু নামের অদ্ভুত আর্ধার আর হিসাবপত্র কল্পনা করা। নিজে সবার চাইতে সৎ ভাবতে ভাবতে বুড়ির জীবনে আর কোনো পাপকর্মের কথা মনে পড়েনা। সে ধরেই নিয়েছে যে তার গন্তব্য স্বর্গ। কিন্তু মাঝে মাঝে পৃথিবীর জন্য বড় মায়া হয়। হাজারো পদধ্বনি মুখর এই উঠোন, এই রাস্তা, এই ঘরবাড়ী এত আত্মীয় স্বজন, সন্তান, নাতি, পুত্র, লতি। এই সব ছেড়ে কোন অজানায়, কার দুয়ারে কড়া নাড়া। পাঁচওয়াজ নামাজ পড়ে তজবিহ গুনে আল্লা আল্লা করে সে এর কোনো সুরাহা করতে পারেনা। নিজের বিছানাপত্র, চাদর, তেল চিটচিটে বালিশটা পর্যন্ত এখন তার খুব প্রিয়। প্রায়ই মাঝরাতে মনজান বিবির ঘুম ভেঙ্গে যায়। নিশ্চর রাত। বহু বহু দূর থেকে ভেসে আসে কুকুরের কান্না, শেয়ালের ডাক। নিজের শাদা টেটনের সুতার মত চুলগুলোতে হাত বুলায়। গর্তে ঢুকে যাওয়া চোখ, আমের আটির মত চোয়াল, সে বালিশে চুলের গন্ধ শুনবে। বুড়ো বয়সে মানুষের মন বোধই খুব সন্দেহ পরায়ন হয়ে উঠে। প্রায় তার মনে হয় উঠোন দিয়ে যেন কে হেঁটে যায়। সে বলে উঠে ‘কে যায়, কে যায়’। তার এই ভঙ্গুর ও ক্ষীণ আওয়াজ মাটির মত নিশ্চরতায় আঘাত করে। মাঝে মাঝে নাতিরা ভয় পায়, বিরক্ত হয়। কত কিছু, কত কাউকে এই জীবনে সে হারিয়ে ফেলেছে। আলাদা ভাবে কাউকে মনে রাখতে পারেনা এখন। চিনচিনে এক কষ্টের ভারে নুয়ে পড়ে বুক। চোখ থেকে অঝরে ঝরতে থাকে অশ্রু। অশ্রুগুলো কঁচকে যাওয়া চামড়ার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে মিশে যায়। শীতের সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনজান বিবি মোরগের ডাক শুনতে পায় কুকুরকুক। কুয়াশায় ষোলাটে হয়ে আছে উঠোন, আশে পাশে লোকজন জাগে কোলাহল শুনা যায়। এই সময়টা মনজানবিবি কাঁথার ভেতরেও কাঁপতে থাকে। তবুও সে বাধ্য হয়ে উঠে পড়ে। জাকি’কে জাগায়। সে ‘অহু আহা’ করে। ধীরে ধীরে কুইরগা থেকে খড় নিয়ে আঙন জ্বালে। শালের ভেতর হতে শীর্ণ হাত দুটো বার করে আঙনে মেলে ধরে, ধীরে ধীরে তার কাঁপুনি কমে যায়। জাকি উঠে পড়ে, একে একে সবাই উঠে পড়ে। অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে আঙন পোহাতে থাকে। ওদিকে সূর্যও ততক্ষণে কিরণ প্রদান করতে থাকে। তখন মনজানবিবির পুত্রবধু চলে যায় ভাপা পিঠা বানাতে, রান্নাঘরে। গুড় আর কোরানো নারকেলের স্বাদ, শীতের সকালে গরম গরম ভাপা পিঠা, বুড়িকে অন্যরকম স্বাদ এনে দেয়। ভাপা পিঠাকে বুড়ি আবার আইল্লার আঙনে পুড়িয়ে লাল শক্ত করে ফেলে। তখন ভেঙ্গে ভেঙ্গে বুড়ির পিঠা খাওয়া দেখলে মনে হয় যেন সে অমৃত খাচ্ছে। এ জন্য জাকি মাঝে মাঝে বলে-দাদীমার পিঠা সবচাইতে বেশী স্বাদ। আজকে সকালে হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল মনজানবিবির। জ্বরের ঘোরে সে উইব্যতে লাগল আবেল তাবোল। সে তখন তার পুত্রবধুর সহায়তা সেবা কামনা করছিল। আর তার পুত্রবধু তখন হাতে গোবর আর মাটি মেখে তা দিয়ে ঘর লেপতে ব্যস্ত ছিল। তখন তার মনে এই ধারণা বন্ধমূল হয় যে আসলে সবাই তার মৃত্যু কামনা করে। সে যেন এই পরিবারে বোঝা সদৃশ। নিজের ওপর এক প্রকার প্রগাঢ় অভিমান চেপে বসল তার আর এতদিন সে যা করেনি আজ তাই করল। নিজের মৃত্যু কামনা করল। এতে নিজের প্রতি যৎসামান্য নিয়ন্ত্রণও সে হারিয়ে ফেলল আর তার অস্তিত্বের ভিত্তি নড়ে উঠল আর সে এত দুর্বলতার ভেতর অবগাহন করলো যেনো মোমবাতির জ্বলেপুড়ে নিভে যাওয়ার আগের কোমল মৃয়মান শিখা। সন্ধ্যার দিকে প্রচণ্ড ঘাম দিয়ে জ্বরটা নেমে গেল। ততক্ষণে ছেলে বাড়ি ফিরেছে। এবং মায়ের কাছে এসে খাটে বসল। মনজানবিবির কপালে হাত রেখে সে গরম অনুভূতি পেল আর জিজ্ঞেস করল-‘এখন কেমন বোধ করছ’। এতে মনজানবিবির অব্যবহারে দৃঢ়ভাবে ঘনীভূত হল। তা একধরনের শক্তি যোগাল আর সে কোনো কথার জবাব দিলনা, চুপ করে থাকল। ছেলে উঠে গেলে সে নাতি জাকিকে ডাকল, তাকে খামার বাড়ীতে যাবার জন্য রাজি করাল। ছেলে বাধা দিল জ্বর নিয়ে ওখানে না যাওয়ার জন্য। এরপর সে সত্যি সত্যি গৌ ধরল এবং চলে গেল।

খামার বাড়ীতে যাওয়ার আগে একমুঠো ভাত পর্যন্ত খেলোনা। ছেলে আর নিজের অপরাধকে ডিঙ্গিয়ে মাকে শাসানোর ক্ষমতা পেলনা তাই বেশি কিছু না বলে তাকে যেতে দিলো। এটুকুতেই জাকি ঘুমিয়ে পড়ল। আত্মাভিমানে ডালুকের মত মনজানবিবির চোখদুটো চকচক করতে লাগল। শীতের রাত তার উপর চাঁদটা জ্বলে উঠেছে তার পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে। জোৎস্নায় যেন ভেসে যাচ্ছে চরাচর। মনজানবিবি তার ঝাপসা চোখে একবার বাইরের দিকে তাকাল। তার নিঃসঙ্গতা তাকে পিড়িত করলো। একটা অদৃশ্য আবেগের সীমার তার বুকের ওপর যেন বসে আছে। সে অনেক্ষন নীরবে কাঁদল। বস্ত্রত তখন সে বেঁচে থাকার সমস্ত আশ্রয় হারিয়ে ফেলেছিল। সে মাথাটা তুলে জাকির দিকে তাকাল। তারপর বিছানায় বসে পড়ল। অনেক্ষন ধরে একইভাবে। তারপর উঠে দাঁড়াল। খামার বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে ক্ষেতের ভেতর আইল ধরে ধীরে ধীরে হাটতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে সে চাঁদ এবং জোৎস্নার মত নিঃসঙ্গ। তার আর বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছেনা। মুলা পাতায় শিশির পড়ে জোৎস্নার আলোতে চিকচিক করছে। সে উবো হয়ে বসে একটা পাতা হাত দিয়ে মুছে ফেলল। একটা পেঁয়াজের ডাঁটা ছিঁড়ল। তারপর সে নেমে গেল পাশের ধান ক্ষেতে। যেখানে ধানগাছ মানুষের মত লম্বা

হয়ে তৈরী করেছে জঙ্গলের। সে প্রথমে তার চপ্পলজোড়া আইলের ওপর রাখল। তারপর ধানগাছের ভেতর বসে পড়ল একজন মদখোরের মত। তারপর আরেকবার তার জন্ম থেকে আজ অন্ধ স্মৃতিগুলো কল্পনা করে দেখার চেষ্টা করল। সমস্ত জীবনটাকে তার দুঃখ ভারাক্রান্ত বলে মনে হল। সে বেচেন থাকার সমস্ত পথ যেন রুদ্ধ করে দিল নিজে। কোমর থেকে সে একটা বিষের বোতল বার করল। তারপর সেটা সে নিজের মুখে ঢেলে দিল আর জীব দিয়ে মুখ পর্যন্ত লেপে বোতলের সবটুকু বিষ সে টেনে নিল নিজের অভ্যন্তরে। সে একজন সুখী বুড়ির মত নীরবে বসে থাকলো কিছুক্ষন। তারপর শুরু হল তার হৃদয় নিংড়ানো যন্ত্রনার। আত্মহত্যা প্রচেষ্টার পর সম্ভবত প্রত্যেক মানুষ শেষ বারের মত ক্ষমা করে দিতে চায় পৃথিবীটাকে। সে সব ব্যর্থতাকে মেনে নিতে চায়। নিজের ভেতর যেন জেগে উঠে দ্বৈতসত্তা। মনজান বিবির অভ্যন্তরে তেমনি একটা সত্তা বাঁচার জন্য তীব্র যুদ্ধ শুরু করলো কিন্তু সে ছিল শক্তিশালী বিষের দ্বারা আক্রান্ত। বিষ তখন তার ভেতরে তার সবটুকু প্রতিক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। তার মনে হল সমস্ত নাড়িভুড়ি একটা বিশাল হাত দিয়ে কে যেন টান মারছে। বুক দিয়ে যেন কি একটা সোজা বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে বুক চেপে ধরল দুহাতে তারপর অভ্যন্তরীণ যন্ত্রনার শারিরিক রূপ দিতে লাগল। সে তার শরীরটাকে একটা ধান মাড়াইকারী যন্ত্রের মত চালিত করলো ধানক্ষেতের ভেতর। ধান ক্ষেতটাকে সে অল্পক্ষনের মধ্যে একটা ঘাসের মাঠে পরিণত করলো। তার শরীরটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল। ঘন্টাখানেক বিষের যন্ত্রনায় নিজেকে তুলে দিয়ে সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিজেকে সে নিয়ে গেল। এক সময় তার শরীরটা নিখর হয়ে পড়ে রইল তার সৃষ্ট ঘাসের মাঠে। সারারাত তার লাশটা ওভাবে পড়ে রইল। যন্ত্রনাদগ্ধ মুখে শাদা ফেনা সহ জাকি সকালে আবিষ্কার করলো তার দাদীকে। সে কেঁদেছিল একটা কান্নাদগ্ধ মানুষের মত অবিরাম ভাবে যা তার বাকী জীবনটায় প্রভাব রেখে গিয়েছিল। এবং যার জন্য জাকি তার বাবা মাকে কখনো ক্ষমা করতে পারেনি।